পাহাড়ের বৈচিত্র্যে মানবিক ঐক্যের সুর: বিজু-সাংগ্রাই-বৈসু-বিষু-চাংক্রান

মো. রেজুয়ান খান

বসন্তের বিদায় আর নতুন বছরের আবাহনে মুখরিত হয়ে উঠেছে সবুজ পাহাড়ের প্রতিটি জনপদ। প্রকৃতির রুক্ষতা মুছে নতুন কুঁড়ির আগমনে সেজেছে অরণ্য। ঠিক এই সময়েই পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জীবনে বছরের শ্রেষ্ঠ সময়ের উপভোগ্য উৎসব বিজু, সাংগ্রাই, বিষু, চাংলান, চাংক্রান, বৈসু ইত্যাদি চৈত্র সংক্রান্তি ও বর্ষবরণ শুরু হচ্ছে। এ যেন পাহাড়ের বৈচিত্র্যে একই সুতোয় গাঁথা মানবিক ঐক্যের তান, লয় ও সুরের মূর্ছনা।

নামের ভিন্নতা থাকলেও সুর একটাই- মৈত্রী, সম্প্রীতি আর উৎসব। চাকমাদের 'বিজু', মারমাদের 'সাংগ্রাই', ত্রিপুরাদের 'বৈসু', তঞ্চঙ্গ্যাদের 'বিষু', ম্রো ও চাকদের 'চাংক্রান'। বাঙালির নববর্ষ আর পাহাড়ের এই প্রাণের উৎসব মিলেমিশে একাকার হয়ে পাহাড়ের বুকে তৈরি করেছে এক অসাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মহোৎসব।

রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি আর বান্দরবান—এই তিন পার্বত্য জেলায় এখন যেন দম ফেলার সময় নেই। শহরের বনরূপা, তবলছড়ি কিংবা রিজার্ভ বাজার থেকে শুরু করে দুর্গম পাহাড়ের ছোটো বাজারগুলোতেও মানুষের উপচে পড়া ভিড়। চাকমাদের ঐতিহ্যবাহী পিনোন-হাদি, মারমাদের থামি, আর ত্রিপুরাদের রিনাই-রিসার দোকানে তরুণ-তরুণীদের ভিড় চোখে পড়ার মতো। আধুনিকতার ছোঁয়ায় এখন এসব পোশাকে এসেছে নতুন নতুন নকশা, যা কেবল পাহাড়িদের নয়, পর্যটকদেরও ভীষণভাবে আকর্ষণ করছে।

শুধু পোশাক নয়, পাহাড়ের বাজারে এখন সুবাস ছড়াচ্ছে বনজ সবজি। চৈত্র সংক্রান্তি আর বর্ষবরণের অপরিহার্য অনুষঙ্গ ‘পাঁজন’ রান্নার জন্য সংগ্রহ করা হচ্ছে বাঁশকোড়ল, তারা গাল্ল্যা, পাহাড়ি আলু আর হরেক রকমের বুনো সবজি। দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ আসছে উৎসবের প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করতে।

পাহাড়ি সম্প্রদায়ের এই উৎসব সাধারণত তিন দিনব্যাপী চলে। তবে এর প্রস্তুতি চলে মাসজুড়ে। ১২ এপ্রিল ফুল বিজু ও বৈসু, এ সময়ে পাহাড়ি হ্রদে ফুল দিয়ে প্রার্থনা করা হয়, অনেকে বলে থাকে ফুল ভাসানো হয়, প্রকৃতপক্ষে চাকমা সম্প্রদায় ফুলকে শ্রদ্ধা করে, প্রণাম করে- একে ভাসায় না বরং গছিয়ে দেয়। ১৩ এপ্রিল ৩০ চৈত্র বাংলা বর্ষের শেষ দিন হলো মূল বিজু ও বৈসু। এদিনে নতুন কাপড় পরিধান করা হয়, এদিনে চাকমা সম্প্রদায় জুনিয়রদের সেলামি দিয়ে থাকে এবং বাড়িতে বাড়িতে পাজন রন্ধন (অনেক সবজির সমষ্টিতে বিশেষ খাবার) উৎসব উদযাপিত হয় এবং ১৪ এপ্রিল নববর্ষ বুদ্ধিস্ট সম্প্রদায় প্রার্থনার জন্য খেয়াং-এ আসেন এবং মারমা সম্প্রদায় সাংগ্রাই উৎসবে জলকেলি ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করে থাকে।

উৎসবের প্রথম দিনকে বলা হয় ‘ফুল বিজু’। ১২ এপ্রিল ভোরে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে শিশু-কিশোর ও তরুণ-তরুণীরা পাহাড়ি ঝরনা বা হ্রদের তীরে ভিড় জমায়। তারা ফুল সংগ্রহ করে নদী বা কাপ্তাই হ্রদের শান্ত জলে ফুল সমপর্ণ করে প্রার্থনা করে। এটি পুরনো বছরের গ্লানি মুছে ফেলার এবং প্রকৃতির প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর এক প্রতীকী আয়োজন। ঘরদোর ফুল দিয়ে সাজানো আর পবিত্র স্নানের মাধ্যমে তারা নতুন দিনকে স্বাগত জানায়।

১৩ এপ্রিল অর্থাৎ চৈত্র সংক্রান্তির দিনটি হলো ‘মূল বিজু’। এই দিনে ঘরে ঘরে রান্না হয় ঐতিহ্যবাহী খাবার ‘পাঁজন’। এটি কেবল একটি খাবার নয়, এটি হলো পাহাড়ি সংস্কৃতির এক বিশাল সমন্বয়। কমপক্ষে ৩০ থেকে ৪০ প্রকারের সবজি (অনেকে ১০৮ রকমের সবজি ব্যবহার করেন) দিয়ে রান্না করা এই খাবারটি অত্যন্ত পুষ্টিকর ও সুস্বাদু। এই দিনে পাহাড়িদের ঘরে কোনো ভেদাভেদ থাকে না। পরিচিত-অপরিচিত যে কেউ বাড়িতে আসলে তাদের পাঁচন দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়। বাড়িতে বাড়িতে চলে আড্ডার আসর আর আনন্দ আয়োজন।

১৪ এপ্রিল, পহেলা বৈশাখের দিনটি হলো বিশ্রামের। চাকমা ভাষায় একে বলা হয় ‘গোরজ্যাপোরজ্যা দিন’। এই দিনে বড়োদের আশীর্বাদ নেওয়া হয়, মন্দিরে গিয়ে বুদ্ধ পূজা করা হয় এবং বয়োজ্যেষ্ঠদের স্নান করিয়ে নতুন কাপড় উপহার দেওয়া হয়। মারমা সম্প্রদায় এই দিনে আয়োজন করে তাদের সবচেয়ে আকর্ষণীয় উৎসব ‘জলকেলি’ বা পানি খেলা।

মারমা সম্প্রদায়ের নববর্ষ উৎসব ‘সাংগ্রাই’-এর মূল আকর্ষণ হলো জলকেলি, যা তাদের ভাষায় ‘রি-লং পোয়ে’ নামে পরিচিত। তারা বিশ্বাস করে, পানি দিয়ে একে অপরকে ভেজানোর মাধ্যমে গত বছরের সমস্ত পাপ, দুঃখ আর গ্লানি ধুয়ে মুছে যায়। এটি কেবল খেলা নয়, এটি তরুণ-তরুণীদের একে অপরের প্রতি ভালোবাসা এবং সম্প্রীতি প্রকাশের এক শৈল্পিক মাধ্যম। জলকেলির সেই দৃশ্য দেখতে প্রতি বছর ভিড় জমায় হাজার হাজার দেশি-বিদেশি পর্যটক।

এ ধরনের উৎসবের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো ‘পাঁচন’ বা 'পাজন'। রন্ধনকৃত সুস্বাদু এই তরকারিতে বাঁশকোড়ল, পাহাড়ি কচু, শিম বিচি, কাঁঠালের বিচি, মটরশুঁটি এবং বিভিন্ন বুনো শাকসবজি ব্যবহার করা হয়। স্বাদের ভিন্নতা

আনতে অনেকে এতে শুটকি মাছ বা ‘সিদল’ (এক প্রকার পাহাড়ি শুটকি পেস্ট) ব্যবহার করেন। রান্নার বৈশিষ্ট্য হলো এর ধীর জ্বাল। মাটির উনুনে অনেকক্ষণ ধরে রান্না করায় সবজির রসগুলো মিলেমিশে এক অপূর্ব স্বাদ তৈরি করে। পাহাড়ের মানুষের মতে, বছরের এই দিনে পাঁচন খেলে শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

উৎসব চলাকালীন পাহাড়ের আনাচে-কানাচে চলে লোকজ ক্রীড়া ও নৃত্যের মহড়া। ত্রিপুরাদের ‘গরাইয়া নৃত্য’ এক অনন্য আকর্ষণ। মুখোশ পরে আর হাতে লাঠি নিয়ে এই নৃত্যে ফুটে ওঠে প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থার চিত্র। এছাড়াও চাকমাদের ‘ঘিলা খেলা’, ‘বলি খেলা’ আর ম্রোদের ‘বাঁশি নাচ’ উৎসবের রং বাড়িয়ে দেয় কয়েক গুণ। ছোটো ছোটো পাহাড়ের চূড়ায় যখন বাঁশির সুর ভেসে বেড়ায়, তখন মনে হয় পুরো প্রকৃতি যেন উৎসবে মেতেছে।

বিগত কয়েক বছরে পার্বত্য চট্টগ্রামের এই উৎসব কেবল পাহাড়ি সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। সমতলের বাঙালি আর পাহাড়ের বিভিন্ন সম্প্রদায় জাতিগোষ্ঠীর মেলবন্ধনে এটি এখন জাতীয় উৎসবে রূপ নিয়েছে। প্রযুক্তি ও যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতির ফলে দুর্গম পাহাড়ের এসব উৎসব এখন পর্যটকদের জন্য অনেক বেশি উপলভ্য হয়েছে। জেলা প্রশাসনের নিরাপত্তা বেষ্টনী আর পাহাড়িদের অকৃত্রিম ভালোবাসায় এই অঞ্চল হয়ে ওঠে পর্যটনের কেন্দ্রবিন্দু। খাগড়াছড়ির আলুটিলা, সাজেক ভ্যালি কিংবা বান্দরবানের নীলগিরি- সবখানেই এখন পাহাড়ি এসব আকর্ষণীয় অনুষ্ঠানের রেশ।

বিজু, সাংগ্রাই, বিষু, চাংলান, চাংক্রান কিংবা বৈসু নাম যা-ই হোক না কেন, এই উৎসবের মূল বাণী হলো শান্তি। পাহাড়ের মানুষ চায় তাদের কৃষ্টি, ঐতিহ্য আর সংস্কৃতি টিকে থাকুক অনাদিকাল। হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে নতুন বছরে পাহাড় হয়ে উঠুক শান্তির এক লীলাভূমি। ১২ এপ্রিল থেকে শুরু হওয়া এই উৎসব যখন ১৪ এপ্রিল শেষ হবে, তখন যেন সবার মনে একটাই আশা থাকে- আগামী দিনগুলো যেন পাহাড়ের ঝরনার মতোই স্বচ্ছ এবং চিরহরিৎ বনের মতোই প্রাণবন্ত হয়।

#

লেখক: জনসংযোগ কর্মকর্তা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

পিআইডি ফিচার